তারিখ MAY 24 1998
পৃষ্ঠা

দৈনিক জনকণ্ঠ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কি বিশ্ববিদ্যালয় না থেকে স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কার্যত যুদ্ধাবস্থা ও চরম উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ আগামী ৩১ মে পর্যন্ত স্থগিত। গত শনিবার পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার খবর অনুযায়ী ছাত্রশিবির ডাক দিয়েছে অনির্দিষ্টকাল বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধের। গত শুক্রবার শিবিরের এক সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের 'বিশাল বাহিনী জীবন বাজি রেখে যে কোন মূল্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগকে উৎখাত করবে।' এটা নিঃসন্দেহে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণাই বটে। ওদিকে ছাত্রলীগও বসে নেই। ছাত্রশিবির যেমন বহিরাগত সশস্ত্র ক্যাডারদের সমবেত করছে, অনুরূপভাবে ছাত্রলীগও প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে তাদের যেখানে যতটা প্রভাব ও অবস্থান রয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে। 'সাজ সাজ' রব দু'পক্ষেই।

ছাত্রশিবির আর ছাত্রলীগের সংঘাত-সংঘর্ষের কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন। প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনে। আগামী মাসে যাদের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে বসার কথা সেই হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন অনুষদের ভর্তি কমিটি মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সাক্ষাতকারের সময়সীমা পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারছে না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির-ছাত্রলীগের এই মুখোমুখি অবস্থান, সংঘর্ষ এবং ছাত্রশিবিরের যুদ্ধ ঘোষণা কেন, কিসের জন্য, এ প্রশ্ন দেশবাসীর মনে জাগা স্বাভাবিক। জবাব হচ্ছে, আধিপত্যের জন্য। ১৯৮৬ সালের ২৬ নবেম্বর ছাত্রসমাজ নেতা হামিদের হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে তার জমিদারী, দুর্গ বা মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করে। এক দশক ধরে ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা একের পর এক ছাত্রকে পঙ্গু করে, খুন করে ক্যাম্পাসে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রাখে। এক দশকে তাদের হাতে নিহত হয় ৮ ছাত্র। গত ২ বছরেই শিবিরের ক্যাডারদের হাতে এক ছাত্রলীগ কর্মী, এক ভর্তিচ্ছু ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের পুত্র, এক মেডিক্যাল ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়নের এক নেতা নিহত হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য--কেউ নিস্তার পায়নি তাদের হামলা ও নিগ্রহ থেকে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে বোধগম্য কারণে ছাত্রলীগ চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং শিবির যে পন্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল সেই একই পন্থায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়। শিবিরের নিশ্ছিদ্র দুর্গে তারা কিছু কিছু ফাটলও ধরাতে সক্ষম হয়। স্বভাবতই ছাত্রশিবিরের পক্ষে ছাত্রলীগের এই ঔদ্ধত্য চোখ বুজে সহ্য করা সম্ভব নয়। ছাত্রশিবির ও তাদের মূল দলটির ধারণা হয়ত এই যে, সশস্ত্র ক্যাডার সংখ্যা ও অস্ত্রবাজিতে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অন্যরা তাদের সামনে শিশু মাত্র। তদুপরি, তাদের রাজনীতির পালে এখন নতুন হাওয়া। এ দেশের রাজনীতির দুই প্রধান প্রতিপক্ষের চওড়া কাঁধে পর্যায়ক্রমে সওয়ার হয়ে এবং সংঘর্ষে-সংঘাতের প্ররোচনা দিয়ে তাদের চতুর নেতৃত্ব তাদেরকে অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছে। এখন তাদের সময় হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করার।

এখানে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, দেশের একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগেরও অধিককাল ধরে যে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, আধিপত্যের লড়াই, একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলে এসেছে এবং এখনও চলছে, এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন ও পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলোর ভূমিকা কি ছিল এবং এখনও বা কি? ক্যাম্পাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য এ পর্যন্ত কারও কি বিচার হয়েছে? কেউ কি সাজা পেয়েছে? মামলা অবশ্য হয়েছে একাধিক। কিন্তু বিচার শেষ হয়নি কোনটিরও। তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু সে সব কমিটির রিপোর্ট কখনও প্রকাশিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন দোষী বা সন্ত্রাসীকে একাডেমিক শাস্তি পর্যন্ত দেয়নি বা দিতে পারেনি। কোন হত্যাকাণ্ড বা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার পরে ওসব ঘটনার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত যাদের পুলিশ গ্রেফতার করে তারা সবাই জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। ছাত্র হত্যার একটি মামলারও চার্জশীট পুলিশ রহস্যজনকভাবে দিতে পারেনি যথাসময়ে। সন্ত্রাসীরা, এমনকি হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বাসিত হয়েছে। একটি হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত বলে কথিত শিবিরের দুই ক্যাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদেও নিয়োগ লাভ করেছে। এমনি করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে সন্ত্রাসী ও খুনীদের অভয়াশ্রম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হবে। এজন্য সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে কঠোর মনোভাব ও পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন দল বা তার অঙ্গসংগঠন যদি মনে করে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ঘাঁটি ছিল এবং ভবিষ্যতেও তারা অস্ত্রবলে তাই রাখবে, তাদের সেই ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে। ছাত্রলীগও যদি মনে করে যে, তাদের দল ক্ষমতায় থাকার সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে তাদের ক্যাডারদের মৃগয়া ক্ষেত্র; সেই ধারণাও ভেঙ্গে দিতে হবে। একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডারদের জমিদারী হতে পারে না। হতে দেয়া উচিত নয় দেশ ও জাতির স্বার্থে। এই সত্য অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ছাত্রশিবির ও তাদের মূল দলটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তারা অস্ত্র ও সন্ত্রাসনির্ভর হতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ক্ষমতাসীন দল ও তার অঙ্গসংগঠনের সন্ত্রাসনির্ভর হবার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাই আওয়ামী লীগের উচিত ছাত্রলীগের ক্যাডারদের সংযত করা।

প্রসঙ্গক্রমে গত শনিবার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খুলনার একটি খবর নিয়ে দুটো কথা না বললেই নয়। খুলনার জনৈক ওয়ার্ড কমিশনার ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগে যোগদান করে প্রথমবার খবরে পরিণত হন। তিনি ছিলেন বিএনপি নেতা এবং ৫টি হত্যা মামলাসহ ৩২টি মামলার আসামী। তাকে গ্রেফতারের জন্য খুলনার পুলিশ কমিশনার ৫০ হাজার টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগে যোগদানের ফলে কিংবা গুণে তিনি গ্রেফতার হননি। এতদিন পরে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা দলের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয়? একজন সন্ত্রাসীকে দলে স্থান দিলে দলের ভাবমূর্তি যে উজ্জ্বল হয় না এটা বুঝতে উক্ত নেতাদের এতদিন কেন লাগল? তাঁরা কি তাঁদের দলকে সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের শোধনাগার ভেবেছিলেন?